কার্ল মার্কস : জীবন-সংগ্রাম ও শিক্ষা

১৮৪০-এর দশক। ইউরোপের বুকে ক্রম অগ্রসরমান জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন তখন যোগ্য বাহক খুঁজে বেড়াচ্ছে। মধ্য যুগ পার করে এসে এযাবতকাল যারা জ্ঞান চর্চার সহায়ক ছিল, সেই পুঁজিপতি শ্রেণির সদস্যরা এখন আর সত্য জানতে বা জানাতে চায় না। সমাজজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের এখন চাই মিথ্যা বা অর্ধ সত্য। ভুল তথ্য আর কথার মারপ্যাঁচ। ওদিকে শোষিত-নিপীড়িত জনসাধারণ জানতে চায়, তাদের জীবনের চলমান দারিদ্র্য, বেকারি, অস্বাস্থ্য-অশিক্ষা, গৃহাভাব ইত্যাদি যাবতীয় দুঃখ দুর্দশার পেছনের যথার্থ কারণ কী—সেসবের আসল উৎস কোথায়। খালি চোখে, সরল দৃষ্টিতে সব জিনিস বাস্তবে বোঝা যায় না। তাদের তাই জ্ঞানের রাজ্যে ঢুকতে হবে, সত্য সন্ধানী দর্শনের বোধ আয়ত্ত করতে হবে, বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সত্যকেও বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। এইভাবেই দুই তরফের মেলবন্ধন সম্ভব হবে।

এত সহজ করে বুঝিয়ে দিলে তো সকলেই বুঝতে পারে। কিন্তু দেবে কে? আমাদের চারপাশে এমন জ্ঞানী মানুষ আমরা পাই কোথায়? একজন এমন মানুষ এসেছিলেন দুই শ বছর আগে। এই কথাটা এরকম সহজ করে সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যিনি, তাঁর নাম কার্ল মার্কস। তাঁর ১৮৪৪ সালের সেই চিরস্মরণীয় প্রাসঙ্গিক একখানি বাক্য আজ আবার আমাদের স্মৃতির দরজাতে এসে ধাক্কা দিচ্ছে : 'As philosophy finds its material weapon in the proletariat, so the proletariat finds its spiritual weapon in philosophy.' অর্থাৎ, জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শনের অগ্রগতি এখন থেকে ঘটবে সর্বহারাশ্রেণির হাত ধরে; আর সর্বহারাশ্রেণি তার মুক্তির দিশা খুঁজে পাবে সেই জ্ঞানের মশালের আলোতে।

এইভাবেই মার্কসবাদের জন্ম হয়েছিল। মার্কসেরও মার্কসবাদী হতে সময় লেগেছে। এঙ্গেলসকে সঙ্গে নিয়েই তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন, হেগেলের ভাববাদী দর্শন থেকে। সেই জর্জ উইলহেম হেগেল—যিনি একদিন সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার শ্লোগানে উদ্বেলিত হয়ে ১৭৮৯ সালের বাস্তিলের কারাগার ভাঙা জনজোয়ারে জেগে ওঠা ফরাসি বিপ্লবকে দু হাত তুলে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সেই দর্শনকেই মার্কস প্রথমে হাতিয়ার করতে চেয়েছিলেন, মানবমুক্তির পথের সন্ধানে। অচিরেই বুঝলেন, এ দিয়ে তাঁর কাজ হবে না। কেন না, একই হেগেলীয় বিশ্ববীক্ষা—পরে প্রুশিয়ার স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে মনে করেছে সভ্যতার অন্তিম পরাকাষ্ঠা। আর জার্মানিতে তার বিরুদ্ধেই তখন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে।

অতএব লুডবিগ ফয়েরবাখ। ইনি কঠোর বস্তুবাদী যুক্তিতে হেগেলের ভাববাদকে একেবারে উন্মোচিত করে দিলেন। খ্রিষ্টধর্মের সুদীর্ঘ পৌরাণিক ঐতিহ্যকে তিনি তছনছ করে দিলেন তথ্যের যুক্তিতে। মার্কস আর এঙ্গেলস দুজনেই ফয়েরবাখের ভক্ত বনে গেলেন। কিন্তু তারপর তাঁরা দেখলেন, ফয়েরবাখ যখন বস্তুবাদী তখন তিনি ইতিহাস মানেন না, ইতিহাসের ব্যাখ্যা দিতে পারেন না; আর তিনি যখন ইতিহাসের ব্যাখ্যা দিতে উদ্যোগী হন, তখন আর তিনি বস্তুবাদ অবলম্বন করতে পারেন না। 'As far as Feuerbach is materialist he does not deal with history, and as far as he considers history he is not a materialist. With him materialism and history diverge completely...' এমনটা হলে বাস্তব জীবন সংগ্রামের মধ্য থেকে আগামী দুনিয়ার তত্ত্ব তালাশ করবে কীভাবে শোষিত মানুষ?

এভাবেই মার্কস আর এঙ্গেলস উপনীত হলেন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ধারণায়। যেখানে চিন্তার ভিত্তি হল বস্তুবাদ। বস্তু থেকেই চিন্তা; মানব মস্তিষ্কের সঙ্গে বাস্তব বহির্জগতের ঘাত-প্রতিঘাত থেকেই চিন্তাচেতনা, ধ্যানধারণা, মতবাদ-আদর্শ, মূল্যবোধের জন্ম। আর চিন্তার প্রক্রিয়াটি হল দ্বন্দ্বমূলক।

ইউরোপে তখন শিল্প বিপ্লবের ধাক্কায় কৃষি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যে বিপুল কারখানা শ্রমিক কর্মচারীর দল তৈরি হয়েছে, তাদের তখন ভালো করে দুবেলা খাবার জুটছে না। সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত কাজ আর কাজ। কাজের কোনো সময়সূচি নেই। বারো ঘণ্টা বা চৌদ্দ ঘণ্টা করে কাজ। মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই অধিকাংশের-ই। দেশলাই বাক্সের মতো বস্তিঘরে আলুর বস্তার মতো গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে হয় প্রতিটি পরিবারের সদস্যদের। সবচাইতে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশ ইংল্যান্ডের কারখানা শ্রমিকদের এই হাল হকিকত নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন এঙ্গেলস *ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা*। সদ্য কিছু দিন আগে সেখানে চার্টিস্টদের আন্দোলন থেমেছে; ধনতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠী আপাতত সেই আন্দোলনের রাশ টেনে ধরতে পেরেছে ঠিকই, পথেঘাটে বিক্ষোভ মিছিল নেই বটে, কিন্তু বস্তিতে বস্তিতে মজুরদের মধ্যে তখনও রাগ এবং ক্ষোভের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে।

আর কার্ল মার্কস সেই সময় প্যারিস শহরে বসে অ্যাডাম স্মিথের এক বিস্মিত জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। মূল্যের শ্রমতত্ত্ব (labour theory of value) অনুযায়ী ধনতন্ত্রের অর্থনীতিতে যে মোট মূল্য তৈরি হচ্ছে, তা থেকে শ্রমিক পাচ্ছে মজুরি, মালিক পাচ্ছে মুনাফা আর জমির মালিক পাচ্ছে ভাড়া। প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ প্রাপ্য বুঝে পাচ্ছে। অথচ এক দিকে যখন জমি এবং কারখানা মালিকের সম্পদের পাহাড় ফুলে ফেঁপে উঠছে, তখন পাশাপাশি শ্রমিকদের অবস্থা অন্ধকার থেকে ঘন অন্ধকারের দিকে ধাবমান কেন? স্মিথ অনেক খুঁজেও এর সমাধান পাচ্ছিলেন না।

উত্তরটা পেতে মার্কসেরও সময় লেগেছিল। তিনি একটু একটু করে গভীরে ঢুকে ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির চরিত্র ও চালচিত্র ভালো করে বুঝতে চাইছিলেন। ১৮৪৭ সালের পরে তিনি উদ্ঘাটন করে ফেললেন সেই রহস্য। মালিকশ্রেণি শ্রমিকের কাছ থেকে কেড়ে নেয় তার শ্রম (labour), নয়তো তার শ্রমশক্তি (labourpower)। শ্রমিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যয় করে তার শ্রম। মালিক পুঁজিবাদের বাজার দর অনুযায়ী অনেক দরাদরি করে যে দাম দেয় তা একজন মজুরের শ্রমশক্তির বাজার মূল্য। আর সেই শ্রমিক যখন কলে কারখানায় কাজ করে, সে তার শ্রম দিয়ে যা উৎপাদন করে তার বাজার মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় (যার মধ্যে শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্যও ধরা আছে) বেশি। এই উদ্বৃত্তমূল্য থেকেই আসে মুনাফা। অর্থাৎ, একজন শ্রমিক তার শ্রমশক্তি যে মূল্যে বিক্রি করে, আর সেই শ্রমশক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে মূল্য উৎপাদন করে এ দুটো সমান নয়। সে পায় কম, দেয় বেশি। এইখানেই সে ঠকে যায়, মালিক লাভবান হতে থাকে।

এইভাবেই মার্কস ডেভিড রিকার্ডো এবং অ্যাডাম স্মিথের মূল্যের শ্রমতত্ত্বকে গ্রহণ করে তাকে আরও বিকশিত করে শেষ পর্যন্ত উদ্বৃত্ত মূল্যের আর্থসামাজিক উৎসমূলে পৌঁছে যান। এঙ্গেলস মার্কসের এই আবিষ্কারকে তুলনা করেছেন ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের গুরুত্বের সঙ্গে। স্বাভাবিক। একবার এই দুই তত্ত্বই প্রকাশ্যে বলে দিলে মনে হয়, 'এ আর এমনকী। আমাদের তো জানাই ছিল। উনি শুধু মুখ ফুটে আমাদের আগেই বলে ফেলেছেন।' না। ব্যাপারটা এত সোজা নয়। খালি চোখে দেখাজানা তথ্য থেকে এই দুটোর কোনোটাই সরাসরি উপলব্ধি করা যায় না! গভীরে ঢুকতে হয়! বহু তথ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে হয়। তবেই ধীরে ধীরে বিষয়টা স্পষ্ট হতে থাকে।

আবার এই দুই তত্ত্বকেই কী ভীষণ বিরোধিতার সামনে পড়তে হয়েছে! সমালোচনা আর সমালোচনা। ভুল ধরা। ভ্রান্ত প্রমাণ করা। উনিশ শতকের যান্ত্রিক চিন্তার ফসল বলে সাব্যস্ত করা। আজও সেই হট্টগোল থামেনি। ডারউইনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার সামান্য হলেও হয়ত কমে এসেছে। জীববিজ্ঞান বর্তমানে এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে যে, সরাসরি প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণাকে অস্বীকার করা বা ভ্রান্ত বলা ক্রমেই মুশকিল হয়ে উঠছে। এখন নাক ঘুরিয়ে ওতে দর্শন বা ন্যায়শাস্ত্রের তরফে কী কী খুঁত আছে বের করার চেষ্টা চলছে।

মাকগ্রাহ্য ক্তধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে যু িথ্নমালিকশ্রেণির শ্রেণি স্ব ।তড়জি র্থ্নএতে স্ব ,ান নকে ।ইনে তমিকু কুটতএ য়ালবে রসর্বে !খাতে হবে যেদন্যায্য এবং সভ্যতার সমুন্নত পরাকাষ্ঠা বলে মোলিকরা মজুরদের ঠকিয়ে লাভ করছে বললে আত্মসম্মানে লাগে না? ফলে বিশ্বের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে নোবেল পদক ঝোলানো অর্থনীতিবিদদের দিয়ে বলানো হচ্ছে, ধুর, মূল্যের ধারণাই এখন অচল। মূল্য আবার কী? বাজার দাম ছাড়া আর কিছু নেই অর্থনীতিতে। আর কেউ বলছেন, আরে ওই মূল্য তো তৈরি হচ্ছে প্রযুক্তির জোরে। অন্য আর একজন কেউ বোঝাচ্ছেন, না হে না, মূল্য আসছে শক্তির ব্যবহার হিসাব-নিকাশ করে। কিন্তু এনারা সকলেই মুখে না বললেও মনে মনে জানেন, এই সব বলে শেষ পর্যন্ত কোনো লাভই হচ্ছে না। শক্তিই বল আর প্রযুক্তিই বল, এই সবই আসলে উৎপাদনে প্রদান (input), এবং সেই প্রদান হিসাবে এরা কোনো পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় যে মূল্য যোগ করেছে, উৎপন্ন দ্রব্য বা প্রাপ্তি (output)-তে সেই সমান মূল্যই যুক্ত হয়ে থেকেছে। বাড়তি মূল্যের হিসাব এদের থেকে পাওয়া যাবে না। মার্কসের সেই সরল গণিত: $P = C + V + S$, কিছুতেই ভুল প্রমাণ করা যাচ্ছে না! পিথাগোরাসের উপপাদ্যের মতোই সেটি নিউটন, আইনস্টাইন, হাইজেনবার্গ, হকিংস-সহ সকলের সমস্ত ঝড় ঝাপটা সামলে বেঁচে বর্তে আছে।

বিপদ কি শুধু এইটুকু? সেই সরল গণিতের মাধ্যমেই মার্কস দেখিয়েছিলেন, মুনাফার হার $RS = S/ (C + V)$। সুতরাং, নতুন প্রযুক্তি ও যন্ত্রের জন্য খরচ বাড়লে মুনাফার হার কমতে চাইবে। তার ফলে পুঁজিবাদে মুনাফার হার পতনের প্রবণতা লেগেই থাকবে এবং একটা সংকটের ছায়া তার পেছনে ধাওয়া করে চলবে। আর কী আশ্চর্য! ঠিক এই জিনিসটাই ঘটে চলেছে আজও। এই একুশ শতকেও। পুরনো পণ্যের গুণমান বৃদ্ধি করতে এবং নতুন পণ্য বাজারে আনতে গেলে প্রযুক্তির গবেষণায় বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ করতেই হয়। তাতে স্থির পুঁজির পরিমাণ যত বাড়ে, উপরোক্ত অঙ্কের কঠোর নিয়মেই লাভের গুড় তত কমে যেতে পারে।

পুঁজিপতিরা কি এটা মেনে নেবে? না। তারা অন্য উপায় খুঁজবে উদ্বৃত্তমূল্য বৃদ্ধির। আর, আবার দ্বিগুণ অবাক হতে হবে জেনে, মার্কস সেই ব্যাপারেও আমাদের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু টিপ্‌স দিয়ে গেছেন! এবং, সেই কথাগুলো এখনও মার্কসের মৃত্যুর ১৩৫ বছর পরেও একেবারে হুবহু কাজে লেগে যাচ্ছে! যথা : স্থির পুঁজি (C) বাবদ ব্যয় যখন বেড়ে যাচ্ছে, তখন চলতি পুঁজি (V), অর্থাৎ, মজুরি বাবদ খরচ কমাতে হবে। মজুরি ছাঁটাই করা না গেলে, স্থায়ী মজুরের সংখ্যা কমাও। বদলি বা ঠিকা মজুর নিয়োগ কর। নিরাপত্তামূলক বা ভবিষ্যত-সুরক্ষা বাবদ ভাতা ইত্যাদি কমিয়ে বা একেবারে রদ করে দাও। কল্যাণমূলক খাতে খরচ কমিয়ে ফেল বা বন্ধ করে দাও। কাজের সময় অথবা যান্ত্রিক নৈপুণ্য বাড়িয়ে উদ্বৃত্ত ও মজুরির অনুপাত (মার্কস যাকে বলেছেন শোষণের হার, অর্থাৎ, S/V) বৃদ্ধি করতে থাক। ইত্যাদি। চোখ কান খুলে পুঁজিবাদী দুনিয়ার দিকে তাকালে এই সব তথ্য দেখতে এখন আর কষ্ট করতে হয় না।

মার্কস তাঁর তিন খণ্ড *পুঁজি*ভ দগ্রন্থে এই সব বিষয়কে বিশ াবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন ১৮৬৭ সাল থেকে। কিন্তু ১৮৪৮ সালেই তিনি এই সমস্ত প্রশ্নের অনেকখানি সমাধান করে ফেলেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ধনতন্ত্রের বাহিরাঙ্গিক কাঠামোয় অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। পুরনো ফ্যাক্টরি সিস্টেম আর নেই। বাষ্পচালিত যন্ত্রের এখন আর দেখা মিলবে না। এক ছাদের নিচে হাজার

হাজার শ্রমিক জড়ো হয়ে কাজ করার দৃশ্যও এখন দুর্লভ। অবাধ প্রতিযোগিতার যুগ পেরিয়ে পুঁজিবাদ এখন একচেটিয়া স্তরে পৌঁছেছে এবং বিকশিত হয়েছে। পুঁজির মালিকানা এবং বিচরণ স্থলও এখন আর কোনো একটা দেশের ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না। মার্কসের বিবরণের মধ্যে বর্তমান কালের এই সব বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি একই রকম দেখতে পাওয়া যাবে না। কিন্তু যখনই আমরা পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার বাস্তব অর্থনৈতিক পদ্ধতি বুঝতে চাইব, মূল্যের চলাচল বুঝতে চেষ্টা করব, শোষণের প্রক্রিয়া পদ্ধতি এবং হার জানতে আগ্রহী হব, সেই ক্ষেত্রে মার্কস এখনও আমাদের পথ প্রদর্শক! মার্কসবাদ এখনও শোষিত মানুষের দিক-দর্শন!

সমাজ বিকাশের ইতিহাস, বিজ্ঞানের দার্শনিক উপলব্ধি, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি-চারুকলার আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি বিষয়গুলিকে বুঝতে চাইলেও একই কথাপ্রযোজ্য ।